প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের ধিমাল জনজাতি ও বাঙালি জাতির অবস্থানগত পরিচয়

ধিমাল উত্তরবঙ্গের এক বিশেষ জনজাতি। উত্তরবঙ্গে ধিমাল ও বাঙালিদের অবস্থান সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করার আগে উত্তরবঙ্গের অবস্থান সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের একেবারে উত্তরে বর্তমানে সাতটি জেলা (কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা) নিয়ে উত্তরবঙ্গ গঠিত। অবিভক্ত বাংলার যে ভূ-ভাগ গঙ্গা নদীর উত্তর প্রান্তে এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত সাধারণভাবে এই ভূ-ভাগকে উত্তরবঙ্গ বলা হয়। তবে আজও ভারতের কোনো ভৌগোলিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক মানচিত্রে উত্তরবঙ্গ নামে কোনো ভূখণ্ড নির্দিষ্ট করা নেই। ইংরেজ শাসনকাল থেকেই 'North Bengal' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দরূপে 'উত্তরবঙ্গ' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রায় দু'শ ষাট বছর পূর্বে ভারতে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন থেকেই তারা দেশ শাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে বিভক্ত করেন। সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চলকে তারা নাম দিয়েছিলেন 'বঙ্গ প্রেসিডেন্সি' বা 'বঙ্গপ্রদেশ'। আবার প্রান্তিক অবস্থানের ভিত্তিতে বঙ্গের উত্তরপ্রান্তীয় ভূ-ভাগকে নামাঙ্কিত করেছিলেন উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণপ্রান্তীয় ভূ-ভাগকে দক্ষিণবঙ্গ, পূর্বপ্রান্তীয় ভূ-ভাগকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমপ্রান্তীয় ভূ-ভাগকে পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট অখণ্ড ভারত শুধুমাত্র ধর্মের উপর ভিত্তি করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হল। ফলে যুক্ত বঙ্গ প্রদেশটি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ববঙ্গকে পূর্ব পাকিস্তান নামে অভিহিত করা হয়। যুক্তবঙ্গে রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভূক্ত ছিল আটটি জেলা। যেমন— দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদহ, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা। দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, মালদা, দিনাজপুর জেলার পশ্চিমাংশ (পশ্চিম দিনাজপুর জেলা)। আর রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলার পুরোটাই চলে গেল ভিন্ন রাষ্ট্রে (প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান পরে বাংলাদেশ)। প্রাক্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যাধীন করদ ও মিত্ররাজ্য কোচবিহার দেশীয় রাজ্যটি ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বাধীন ভারত সরকারের সঙ্গে এক চুক্তিবলে ভারত সরকারের অধীনে আসে এবং ১৯৫০ সালে ১লা জানুয়ারি থেকে কোচবিহার রাজ্যটি পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চম জেলারূপে আত্মপ্রকাশ করে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সাথে বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া জেলার ইসলামপুর যুক্ত হয়। পরবর্তীতে পশ্চিম দিনাজপুর প্রশাসনিক সুবিধার্থে দুটি ভিন্ন জেলা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আবার ২০১৪ সালে জলপাইগুড়ি

জেলা প্রশাসনিক সুবিধার্থে ভেঙে আলিপুরদুয়ার নামে একটি ভিন্ন জেলা গঠন করে। ফলে বর্তমান উত্তরবঙ্গ মোট সাতটি জেলা নিয়ে গঠিত। এর উত্তর দিকে রয়েছে সিকিম রাজ্য, উত্তরপূর্ব কোণে ভূটান, পূর্বে আসাম, পশ্চিমে বিহার, নেপাল আর দক্ষিণে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা।

বর্তমানে সমগ্র উত্তরবঙ্গের মোট আয়তন— ২১৯৭২ বর্গ কিলোমিটার।

উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রাকৃতিক পরিচয় :

পশ্চিবঙ্গের উত্তরে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যথা—

১. পার্বত্য ভূমি

২. মালভূমি ও

৩. সমভূমি

উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য রয়েছে। তাই একদিকে যেমন পার্বত্যভূমি লক্ষ করা যায়, তেমনি অপরদিকে সমভূমিও রয়েছে। আবার জলাভূমির পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। উত্তরবঙ্গের উত্তরে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা বাদ দিলে দার্জিলিং জেলার প্রায় পুরোটাই পার্বত্যভূমি। তাছাড়া জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশেও পার্বত্যভূমি লক্ষ করা যায়। এখানকার প্রধান প্রধান পর্বতগুলি হল— সান্দাকফু (৩,৬৩০), ফালুট, সবরগ্রাম, টংলু, সিঞ্চল, দুরবিনদায়ার। এই পার্বত্য অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি পাললিক ও রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলটি উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ ঢালু হয়ে গিয়েছে। অসংখ্য ছোট বড় নদ-নদী উত্তবঙ্গের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। এখানকার প্রধান নদী তিস্তা। এছাড়া মহানন্দা, জলঢাকা, রায়ডাক, সঙ্কোশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিস্তার পশ্চিমের অংশ তরাই আর পূর্বের অংশ ডুয়ার্স নামে পরিচিত। এই তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে নানা শ্রেণির ছোট বড় উদ্ভিদ রয়েছে। শাল, সেগুন, শিশু এর মধ্যে প্রধান।

উত্তর বঙ্গের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই আবহাওয়া ও জলবায়ুর বিরাট বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। দার্জিলিং এর পার্বত্য অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা থাকে ১২°-১৫° সেলসিয়াস। আর শীতকালে ২°-৮°। আবার কখনো কখনো উষ্ণতা ২°-৪° সেলসিয়াস নেমে আসে। উত্তরবঙ্গেরই অন্যান্য ছয় জেলাতে উষ্ণতার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

বৃষ্টিপাতের দিক থেকেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। দার্জিলিং জেলায় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত হয় ৩০০ সেমি। আর তরাই ও ডুয়ার্সে তা অনেক বেশি ৪৫০ সেমির মতো। সুতরাং দেখা যায় মানুষের বৈচিত্র্যের মতো ভূ-প্রকৃতিও নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

উত্তরবঙ্গের জাতিগত বৈচিত্র্য :

উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতিতে যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি উত্তরবঙ্গের মানুষজনের মধ্যেও বৈচিত্র্য রয়েছে। এখানে মিলন ঘটেছে সমতলের সঙ্গে পাহাড়ি মানুষের। স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই অর্থাৎ বিগত কয়েকশো বছর ধরে জীবন ও জীবিকার সূত্রে উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে বহুবিচিত্র জাতি ও জনজাতির স্রোত বয়ে গেছে। নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সমভূমি, অরণ্যভূমি ও কৃষিভূমির নিবিড় সান্নিধ্যে এখানে গড়ে উঠেছে এক বহুমাত্রিক বর্ণময় সমাজ ও সংস্কৃতি। তাই অনেকে উত্তরবঙ্গকে সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে বর্ণনা করেছেন। বর্তমান ভারতের প্রায় সবকটি ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষই বসবাস করে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত এলাকায়। ১৯৭১ সালে ভারতীয় আদম সুমারির হিসাব অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ৭৪,১৮,৬৬৩। তার মধ্যে তফশিলী জাতির সংখ্যা ২০,০৭,৭৭৩ এবং তফশিলী উপজাতির সংখ্যা ৮,৯৯,৮২৪। তফশিলী উপজাতিদের মধ্যে দুটি ধারা প্রধান। একটি মোঙ্গলীয় ও অন্যটি আদি অস্ট্রাল (Proto Australoids)। মোঙ্গলীয় উপজাতিগুলি উত্তরবঙ্গের উত্তর-পূর্ব অন্তঃরাজ্যগুলি থেকে এসেছে। ইংরেজরা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করার অনেক আগে থেকেই মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর লোকেরা বিশেষ করে ধিমাল, টোটো, মেচ, লিম্বু, রাভা, গারো, তামাং, লেপচা, ভুটিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি জনজাতির মানুষ উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে তরাই অঞ্চলের ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে বসবাস করে আসছিল। তারপর ইংরেজরা যখন উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলায় চা-বাগান পত্তন করেন তখন চা-বাগানের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। স্থানীয় জনগণ পর্যাপ্ত না হওয়ায় বাইরের থেকে বিশেষ করে ছোটনাগপুর, ওড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্য থেকে প্রচুর লোককে নিয়ে আসা হয় শিল্পের প্রয়োজনে। এই সমস্ত শ্রমিকরা ছিল অধিকাংশ ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, মালপাহাড়ি, বরাইক, চিক-বরাইক, রাউতিয়া, সাঁওবিয়া, হো, তুরী, ঘাসী, মাহালি গোঁড়, খেরিয়া, খেরোয়ার, মাঙ্কিমুণ্ডা— যারা উত্তরবঙ্গে কাজের জন্য এসে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছে। তাছাড়া নেপাল থেকেও প্রচুর নেপালী শ্রমিকরা উত্তরবঙ্গের

ডুয়ার্স এলাকায় এসে বসতি নির্মাণ করেছে। এরপর যখন ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হল তখন পূর্বপাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকেও প্রচুর সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় নিঃস্ব হয়ে কাতারে কাতারে পাড়ি জমিয়েছে উত্তরবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলাতেই।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক যে উদ্বাস্তু সংখ্যার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তা থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যারও পরিচয় পাওয়া যায়। যা নীচে তুলে ধরা হল—

জেলার নাম	উদ্বাস্তু সংখ্যা	শতাংশের অনুপাত
কোচবিহার	৯,৯৯,১৭	১৪.৮৯
জলপাইগুড়ি	৯৮,৫৭২	১০.৭৮
দার্জিলিং	১৫,৭৩৫	৩.৫৩
পশ্চিম দিনাজপুর	১,১৫,৫১০	১৬.০৩
মালদা	৬০,১৯৮	৬.৪২[১]

১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার গ্রাম ও শহর ভিত্তিক উদ্বাস্তু সংখ্যা—

জেলার নাম	মোট উদ্বাস্তু সংখ্যা	গ্রামীণ	শহর
কোচবিহার	২,৫২,৭৫৩	২,২৭,৬২৮	২৫,১২৫
জলপাইগুড়ি	২,১৮,৩৪১	১,৭১,৬১৭	৪৬,৭২৪
পশ্চিম দিনাজপুর	১,৭২,২৩৭	১,২৫,১৫৫	৪৭,০৮২[২]

১৯৭১ সালের উদ্বাস্তু সংখ্যার চিত্র—

জেলার নাম	উদ্বাস্তু সংখ্যা
কোচবিহার	৪,৪২০০০
জলপাইগুড়ি	২,৪৯০০০
দার্জিলিং	৪৮০০০
পশ্চিম দিনাজপুর	২,৯২,৫০০
মালদা	১,২৭,৫০০[৩]

তবে উত্তরবঙ্গের উত্তর দিকে ঘন জঙ্গল, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ ও পাহাড়-পর্বত থাকায় কৃষি কাজের তেমন প্রসার ঘটেনি। চাষের মধ্যে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় চা চাষই প্রধান

ছিল। কোচবিহার জেলায় সামান্য ধান হতো। তবে উত্তরবঙ্গের দক্ষিণের জেলাগুলি বিশেষ করে দুই দিনাজপুর, মালদহ জেলা সমভূমি হওয়ায় প্রথম থেকেই কৃষির পক্ষে উপযুক্ত ছিল। মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর লোকেরা উত্তরবঙ্গের উত্তর দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল বলা যায়। ইংরেজ আগমনের প্রাক্‌কালে এখানে দু'ধরনের জন গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। যাদের নিজস্ব ভূমি ছিল তারা ভূমিজ জনগোষ্ঠী। এই শ্রেণিতে রয়েছে, কোচ, পালি, ধিমাল, মেচ, রাজবংশী। আর যাদের নিজস্ব ভূমি ছিল না তারা হল অভূমিজ জনগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, মাহালী, মালপাহাড়ি, করমালী, কোরা, তুরী প্রভৃতি। তাছাড়া উত্তরবঙ্গে চা-বাগান পত্তনকালে লক্ষ করা যায় বাংলার অন্যান্য প্রান্ত থেকে বহু বাঙালি, মারোয়ারি উত্তরবঙ্গে এসেছে ব্যবসার সূত্রে।

সুতরাং উত্তরবঙ্গের আয়তন ক্ষুদ্র হলেও জনবৈচিত্র্যের দিক থেকে বিশাল ভারতের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে এই অঞ্চল।

ধিমাল জনজাতির পরিচয় :

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনজাতির মধ্যে এক বিশেষ জনজাতি হল ধিমাল। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নানা জাতি, জনজাতি, বর্ণ ও ধর্মের লোকেরা উত্তরবঙ্গে পদার্পণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছে, কেউ বা ইতিহাসের নিয়মে কিছুকাল এখানে অবস্থান করে অন্যত্র চলে গিয়েছে, আবার কেউ কেউ মিশে গিয়েছে পরবর্তী মানব প্রবাহের সঙ্গে। হাজার বাধা-বিপত্তি ও অস্তিত্বের সঙ্কটের মধ্যে থেকেও যে সমস্ত জনজাতি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখে চলেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল ধিমাল জনজাতি। সভ্য জগতের সংস্পর্শ এড়িয়ে ধিমালরা আজও যেভাবে নিজেদের আদিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে চলেছে তাতে বিস্মিত হতে হয়। তাদের রীতিনীতি খাদ্যাভ্যাস দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি, লোকাচার, লোকগীত, নৃত্যের ধারা, বিবাহ, মৃত্যু সংস্কারের পদ্ধতিতে স্বকীয়তা আজও ধরে রেখেছে।

ধিমাল জনজাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় :

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে ধিমাল জনজাতি মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন শাখা। দৈহিক গঠনের দিক থেকে লিম্বুদের সঙ্গে ধিমালদের গভীর সাদৃশ্য আছে। গাত্রবর্ণ অর্থাৎ গায়ের

রঙ সাধারণত গাঢ় তামাটে। মাথায় মোটা, সোজা ও ঘন চুল রয়েছে। দাড়ি, গোঁফ ও গায়ে লোম কম। চোখ ছোট। চোখের মণি কালো, চোখের পাতা ফোলা ও মঙ্গোলয়েড ভাঁজ রয়েছে। মুখমণ্ডল চতুষ্কোণাকৃতি, চর্বিযুক্ত গাল বর্তমান। নাক চ্যাপ্টা, ছোট, প্রশস্ত নাসাছিদ্র। পাতলা লম্বা কান, শক্তপোক্ত দেহের গঠন, গড় উচ্চতা ১৬৪.৭ সেমি।

ধিমাল জনজাতির বর্তমান ক্ষেত্র :

বর্তমান ধিমাল জনজাতির লোকেরা উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম শহর শিলিগুড়ি থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে দার্জিলিং জেলার তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মোট চৌদ্দটি গ্রামে বাস করে—

জোতের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	পরিবারের সংখ্যা	জনসংখ্যা
১. হোচাইমল্লিক জোত	হাতিঘিসা	৯	৫৩
২. গঞ্জুমল্লিক জোত	,,	২	১৬
৩. কেটুগাবুর (১)	,,	১৭	১০৭
৪. সদামল্লিক জোত	,,	৪০	৩১০
৫. মৌরি জোত	,,	১০	৫৫
৬. মেটলি জোত	,,	১০	৪৮
৭. বড়ো ঝড়ু	,,	২	৯
৮. চাকু	,,	৪	২০
৯. ছোট জমিদারগুড়ি	,,	১০	৪৫
১০. রামভোলা মল্লিক	বুড়াগঞ্জ	৪	১৬
১১. কেটুগাবুর (২)	মণিরাম	১২	৫০
১২. শিউবর	,,	২৮	২৪০
১৩. ঝাবু	,,	৮	২৮
১৪. শিলিগুড়ি	,,	২	৫
		১৫৮	১০০২

এছাড়াও উত্তরবঙ্গের বাইরে অর্থাৎ নেপালের তরাই অঞ্চলেও ধিমালদের অবস্থান লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে নেপালের ঝাপা জেলায় তেরটি ও মোরাং জেলায় চৌদ্দটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ধিমালরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছে।

উত্তরবঙ্গের ধিমালদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় :

ধিমালরা মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর শাখা। আদিম অবস্থায় ধিমালদের মধ্যে কোন বর্ণ বৈষম্য ছিল না। সামাজিক ভেদ কিংবা তাদের মধ্যে কোন গোত্রও লক্ষ করা যায় না। তবে উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে এসে যখন তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে তখন থেকেই তাদের জীবনে হিন্দু-সংস্কৃতির বৃহৎ প্রভাব পড়তে থাকে। বর্ণবৈষম্যহীন ধিমাল সমাজ ব্যবস্থায় এর প্রথম প্রকাশ দেখা যায় মৃতদেহ সৎকার প্রথার মধ্যে। মৃতদেহ সমাধিতে বিশ্বাসী ধিমালরা ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে পৌঁছে হিন্দুদের মতো মৃতদেহ সৎকারে বিশ্বাসী হয়ে অগ্নিয়া নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই সময় H.H.Risley তাঁর 'Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে ধিমালদের তিনটি শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন—

> "The Dhimals are divided into three classes- Agnia, Later and Dungia"[৪]

আর এই তিনটি শ্রেণির মধ্যে অগ্নিয়া বর্ণের লোকেরাই নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। বাকি দুটি শ্রেণিকে নিচু নজরে দেখতেন এবং অগ্নিয়া বর্ণের লোকেরা নিজগোত্রের মধ্যেই বিবাহ করতেন। এই সময় ধিমাল সমাজে চারটি গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়—

১. চোঙবা
২. দাউয়া
৩. কাওয়া
৪. রাঙ্গা

তবে এই সময় ধিমালদের সঙ্গে রাজবংশীদেরও বৈবাহিক সম্পর্ক হত। তখন রাজবংশী তার নিজের পরিচয় হারিয়ে ধিমাল বলে পরিচিতি লাভ করত। ধিমালদের মধ্যে পুরুষের দিক থেকে সাত পুরুষ পর্যন্ত ও নারীর দিক থেকে তিন পুরুষ পর্যন্ত একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

এখন মাসতুতো বোনের সঙ্গেও বিবাহ সামাজিক স্বীকৃতি পাচ্ছে। আবার নিজ গোষ্ঠীর বাইরে থেকে বিবাহ করে আনলেও জাতিয়া প্রধানকে বা গ্রামের মান্য ব্যক্তিদেরকে দন্ডস্বরূপ কিছু টাকা ও মদ দিয়ে সেই বিবাহকে সমাজ স্বীকৃত বলে মেনে নেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

বর্তমানে উত্তরবঙ্গের ধিমাল সমাজে চৌদ্দটি থর (গোত্র)-এর সন্ধান পাওয়া যায়। যথা—

১. দিঙ
২. দোংগে
৩. তালিপা
৪. হরদিয়া
৫. নুনিয়া
৬. হরদিয়া নুনিয়া
৭. রাথুম
৮. অংলাইতি
৯. কাশের
১০. লাতের
১১. লেমবাঙ
১২. থারু
১৩. যোগী
১৪. তেগরে (অগ্নিয়া)

উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি থর (গোত্র)-এর আবার বেশ কয়েকটি করে উপথর (উপগোত্র) রয়েছে। যা তাদের আচার আচরণের ভিন্নতার দিকে লক্ষ করেই নামকরণ করা হয়েছে। যেমন দোংগে গোত্রের উপগোত্রগুলি হল—

দোংগে

১. নুনিয়া ২.দোংগে ৩.শিমূল দোংগে ৪.হরদিয়া দোংগে ৫.লছমি দোংগে ৬.দিং দোংগে ৭. রাজ দোংগে

নুনিয়া দোংগে গোত্রের ধিমালরা মৃতদেহকে সমাধিস্থ করার আগে মৃতের শরীরের সমস্ত অংশে নুন মাখিয়ে দেন। তারপর সমাধিস্থ করেন।

শিমূল দোংগের লোকেরা মৃতদেহকে সমাধিস্থ স্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় বাঁশের মাঞ্চুলির উপর শিমূল গাছের ডাল দিয়ে থাকেন।

হরদিয়া দোংগের লোকেরা আবার মৃতদেহকে সমাধিস্থ করার আগে হলুদ মাখিয়ে দেন। রাস্তায় হলুদ ছিটিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

দিঙ গোত্র দুটি উপগোত্রে বিভক্ত

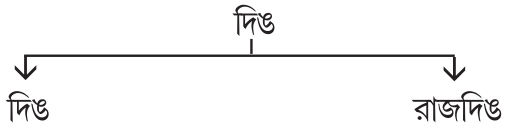

তালিপা গোত্রের উপগোত্রগুলি হল—

ধিমাল সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হলেও নারীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। বিবাহের সময় মা-বাবার থেকে মেয়ের মতামতই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার ইচ্ছেই শেষ কথা। তাছাড়া বিবাহের পরবর্তীকালেও দেখা যায় স্ত্রীর স্বীকৃতি ছাড়া কোন কাজই তার স্বামী করতে সাহস করে না। বিবাহের ক্ষেত্রে ধিমাল সমাজে কন্যাপণ প্রচলিত আছে। অর্থাৎ কন্যা পছন্দ হলে কন্যার পিতাকে খুশি করার জন্য পাত্রকে কিছু টাকা ও মদ দিতে হয়। ধিমাল সমাজে যে প্রধান অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় লোক তাকে জাতিয়া প্রধান বলা হয়। তিনিই ধিমাল সমাজের বিচার সালিশি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। তার কথাই শেষ কথা। তাকে সবাই মান্য করে চলে। তাছাড়া ধিমাল সমাজে ওঝা, ধামী বা দেউসির আলাদা গুরুত্ব আছে। যাদেরকে সবাই মান্য করে। ধিমাল সমাজে ধিমাল জনজাতির ছেলে ১৬/১৭ বছর বয়স হলে বাবা মায়েরা ছেলের বিবাহ দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করতে থাকে। ধিমাল সমাজে ছেলের বাড়ি থেকেই বিবাহের জন্য মেয়ের বাড়িতে প্রস্তাব দেওয়া হয়। মেয়ের বাড়ি থেকে পাত্র খোঁজার প্রচলন ধিমাল সমাজে দেখা যায় না। ধিমালরা তাতে মেয়ের কোন চারিত্রিক ত্রুটি আছে বলে সন্দেহ করে। ধিমাল সমাজে উনিশ শতকের পূর্বে বাল্যবিবাহ প্রথার প্রচলন থাকলেও এখন আর নেই। তবে হিন্দু সমাজের মতো বর্তমান ধিমাল সমাজেও বিধবা বিবাহের প্রচলন লক্ষ করা যায়।

উত্তরবঙ্গের ধিমাল জনজাতির অর্থনৈতিক পরিচয় :

বর্তমান ধিমালদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল কৃষিকাজ। ধিমালরা একসময় যাযাবরের মতো বনে জঙ্গলে শিকার করে বেড়াত এবং জঙ্গল পুড়িয়ে জুম চাষের মাধ্যমে ফসল ফলাত। সেই ফসল ও শিকার করা মাংস অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কাছে বিক্রি করে অথবা বিনিময়ের মাধ্যমে জীবন চাহিদা মেটাত। তবে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে ইংরেজরা এসে একদিকে যেমন নতুন চা-বাগান পত্তন ও রেলপথ বিস্তার করেন তেমনি আবার অন্যদিকে বনভূমিকে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করেন। ফলে ধিমালদের গতানুগতিক জীবন ধারায় পরিবর্তন আসে। শিকারী জীবন ক্ষুণ্ণ হয়। ফলে তারা কোনো উপায় না পেয়ে কৃষি কাজকেই আঁকড়ে ধরে। এ প্রসঙ্গে হরিমাহন সান্যাল তাঁর 'দার্জিলিঙ্গের ইতিহাস' গ্রন্থে 'জাতি নির্ণয় ও তদীয় আনুষঙ্গিক বিবরণ' প্রসঙ্গে বলেছেন—

> *"তরাইয়ের অন্তর্ভুক্ত অতীব কদর্য এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানেই মেচ ও ঢিমাল বংশ বাস করে।...প্রথমত ইহারা পশুবধ ও পশুমাংসাহার দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিত। দ্বিতীয়তঃ পশুপালনই উপজীবিকা ছিল। এ দ্বিবিধ অবস্থায় তাহাদিগের বাসস্থানের নির্ণয় ছিল না। ক্রমান্বয়ে অবস্থার পরিবর্তনে মানসিক উৎকর্ষ নিবন্ধন আজকাল অনেকেই কৃষিকার্যে নিযুক্ত হইতেছে।"*[৫]

বর্তমানে ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে জানা যায় ধিমালরা পূর্বে কৃষি কাজের জন্য গরু বা মোষ ব্যবহার করত না। দা, ঘোংগোই একধরনের কলমছুরি কুড়াল, কোদাল, খোন্তা এগুলিই ছিল কৃষির মূল উপকরণ। এরা এক একটি স্থানে তিন চার বছরের বেশি চাষাবাদ করত না। বর্তমানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আধুনিক যন্ত্রের দ্বারা কৃষিকাজ করে উন্নত মানের ফসল ফলাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের মোট ১৫৮টি এবং ধিমাল পরিবারের মধ্যে একশ পঞ্চাশ (১৫০)টি ধিমাল পরিবারই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তারমধ্যে আশি (৮০ শতাংশ) ভাগ লোকই দিনমজুরের সঙ্গে যুক্ত। এদের বাস্তুভিটে ছাড়া নিজস্ব চাষের জমি নেই। এরা ধিমাল সমাজে অথবা পার্শ্ববর্তী বাঙালি, রাজবংশী ও নেপালী সমাজে গিয়ে দিনমজুরী করে অর্থ উপার্জন করে। এ প্রসঙ্গে Dr. Rishikeshab Raj Regmi তাঁর 'The Dhimal Miraculous Migrants of Himal' গ্রন্থে বলেছেন—

> "There are also a large number of landless families with labour as their main source of income. They work mainly in the local agricultural land of others."[৬]

আর যাদের জমি রয়েছে তাদের সংখ্যাও কম। ধিমাল সমাজে যিনি সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি তার জমির পরিমাণ পঁচিশ বিঘা (২৫)। এরকম ধিমাল পরিবার গোটা উত্তরবঙ্গে পাঁচ থেকে সাতটির মতো রয়েছে। দশ (১০) বিঘা পর্যন্ত জমি রয়েছে এরকম পরিবারের সংখ্যা নয় (৯)। তাছাড়া বেশিরভাগ পরিবারে জমি রয়েছে পাঁচ বিঘার নীচে।

বর্তমান কৃষিজ ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, পাট, গম, সরষে, লঙ্কা, আদা, রসুন, তামাক প্রভৃতি। তাছাড়া তুলোর চাষ এক সময় প্রচলিত থাকলেও এখন আর তা করে না। তবে বেশ কিছু বাড়িতে মাছ চাষের পুকুর লক্ষ করা যায়। পুকুরের পর্যাপ্ত মাছ তাদের অর্থনৈতিক সাশ্রয় ঘটায়। কারণ, তাদেরকে কোনোদিন বাজার থেকে মাছ কিনে খেতে হয় না। ধিমালরা তাদের বাড়িতে গৃহপালিত পশু-পাখি বিশেষ করে শুয়োর, গরু, খরগোশ, হাঁস, মুরগি, পাখি ইত্যাদি পালন করে। এগুলি তাদের খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে কিছুটা অর্থ সংকট দূর করে। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই কুটির শিল্পের প্রচলন আছে। বাড়িতেই তারা তাঁতের সাহায্যে নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ করে গামছা ও ঐতিহ্যবাহী পোশাক দাকাবোনা তৈরি করে। বসার জন্য তৈরি করে ধোকরা, মোড়া। এগুলি দেখতে এতটা সুন্দর যে বর্তমান যান্ত্রিক যুগকে বিস্মিত করে দেয়। তাছাড়া বাঁশের বাদ্যযন্ত্র, মাছ ধরার জন্য বাঁশের তৈরি চাঁচ, হ্যাংগা, জাল তারা নিজ বাড়িতেই তৈরি করে। এরা পাখি ও পশু মারার উস্টি বানাতে পারদর্শী। শুধু তাই নয়, পার্শ্ববর্তী সমাজে এগুলি বিক্রি করেও কিছু আর্থিক অনটন মেটায়। বাড়িতে চাল ও কলা দিয়ে তৈরি তাদের নিজস্ব ইউ (মদ) মহিলারা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। বর্তমান ক্ষেত্রসমীক্ষা করে দেখা গেছে ধিমালদের মধ্যে শিশু শ্রমিকের হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বারো (১২) থেকে ত্রিশ (৩০) বছরের ছেলেরা কেরালা ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই ও দিল্লীর বুকে পাড়ি জমাচ্ছে। মৌরী জোতের দু'একটি পরিবার আবার ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে । কৃষিকাজ ছাড়া সমগ্র ধিমাল সমাজে মাত্র একজন শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত। একজন বি.এস.এফ এর চাকরি করে ও চারজন হোমগার্ডের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। সমগ্র ধিমাল মহিলাদের মধ্যে মাত্র দুজন অঙ্গনওয়ারী কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

ধিমাল জনজাতির উৎস সন্ধান :

ধিমাল জনজাতির লিখিত কোন সুনির্দিষ্ট ইতিহাস নেই। এমনকী তাদের নিজস্ব কোনো লিপিও নেই। আছে শুধু নিজস্ব ভাষা (ধিমাল) আর মানুষ। এই মানুষগুলির মুখে শোনা গল্প, রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনি আর অন্যান্য ইতিহাসের সূত্র ধরে ধিমালদের উদ্ভবের একটি রেখাচিত্র আমরা পাই।

'ধিমাল' এই শব্দটির উৎপত্তি ও অর্থ নিয়েও মতবিরোধ লক্ষ করা যায়। কেউ কেউ বলেছেন 'ধিমাল' কথাটি 'হিমাল' শব্দের অপভ্রংশ। ধিমালরা হিমালয়ের কোলে অর্থাৎ পাদদেশে বসবাস করে বলে এমনটা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার একদল গবেষক মনে করেন মেচ বা কাছাড়ী ভাষায় 'দিমাসা' শব্দের অর্থ যেমন বৃহৎ নদীর সন্তান, তেমনি ধিমাল শব্দটির অর্থ হল নদীতীরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী।

ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Kirat Janakriti' গ্রন্থে বলেছেন ধিমালরা ছিল ভোটব্রহ্ম গোষ্ঠীর শাখা ও কিরাত প্রশাখার অন্তর্গত উপজাতি। এই জনজাতির আগমন খ্রিস্টপূর্ব একহাজার বছরের অনেক আগে অর্থাৎ ভারতে আর্যদের আগমনের অনেক আগে থেকেই ধিমালরা বসবাস করে আসছিল। ধিমালদের উৎপত্তি বিষয়ে বেশকিছু লোককথার প্রচলন আছে ধিমাল সমাজে। নেপালে অবস্থিত ধিমালদের মতো উত্তরবঙ্গের ধিমালরাও বিশ্বাস করে যে— কিরাত ইংবাকার দশ ছেলের মধ্যে কনিষ্ঠ থাংদাবার জ্যেষ্ঠ ছেলে ধিকপ্পা। এই ধিকপ্পার ছেলেরাই হল বর্তমান ধিমাল।

আর এক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে দুই ভাই কাশীতে গিয়েছিল। কাশী থেকে ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে ছোটভাই রাস্তায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন বড় ভাই ছোটভাইকে বিশ্রাম নিতে বলে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে চলে এবং ছোটভাইকে বলে যায় সে যেন কলাগাছের কাটা অংশ দেখে তার পথ অনুসরণ করে। কিন্তু ছোটভাই পথ চলায় ক্লান্ত হয়ে রাস্তায় বিশ্রাম নিয়ে ইউ পানে ব্যস্ত থাকে। তারপর নেশাগ্রস্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে দেখে কাটা কলাগাছগুলি বড় হয়ে গেছে। সুতরাং ভাইয়ের পক্ষে আর অনুসরণ করা সম্ভব হল না। তাই এক ভাই পাহাড়ে উঠে হয়েছে লিম্বু আর অন্য ভাই নীচে অর্থাৎ সমভূমিতে পড়ে থেকে হয়েছে ধিমাল। তাই অবস্থানের পার্থক্য থাকলেও লিম্বু ও ধিমালদের মধ্যে আজও আচার-আচরণ,

রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণ ও বিশ্বাসের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে যা অন্য কোন জনজাতির সঙ্গে নেই। তাই ধিমালরা লিম্বু মেয়েকে বিয়ে করলে সামাজিকভাবে কোন বাধার সম্মুখীন হয় না।

উৎপত্তি সম্পর্কে আর একটি কাহিনিও বেশ জনপ্রিয় আছে ধিমাল সমাজে—

স্বর্গের দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের সভায় কেরকোই ও নেরকোই নামে দুই পরী নৃত্যগীত পরিবেশন করছিলেন। ঢোলক বাদক ছিল সাঁকু ও মাঁকু। তারা দুজনেই দেখতে খুব সুন্দর ছিল। কেরকোই ও নেরকোই নৃত্যরত অবস্থায় বারবার সাঁকু ও মাঁকুর প্রতি দৃষ্টি দেয়। সাঁকু মাঁকুও তাদের দিকে দৃষ্টি দিলে তাদের নৃত্যের তাল ভঙ্গ হয়। ফলে তারা দেবরাজ ইন্দ্রের কোপানলে পড়ে। দেবরাজ ইন্দ্র তাদেরকে স্বর্গে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মর্ত্যে পাঠিয়ে দেয়। স্বর্গের সাঁকু ও মাঁকু মর্ত্যে এসে সুখুনু ও দুখুনু এবং কেরকোই ও নেরকোই হীরা ও মোতি রূপে জন্মগ্রহণ করে। এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে বিবাহ করে। হীরা ও সুখুনুর সন্তান ধিমাল এবং মোতি ও দুখুনুর সন্তান লিম্বু নামে পরিচিতি লাভ করে। তাই আজও ধিমাল ও লিম্বুরা হীরা মোতি কইন্যা নামে জাউরাগেলাই বলে পুজো দিয়ে থাকেন। আর একটি লোককথায় বলা হয়েছে যে ধিমাল ও লিম্বু দুই ভাই পাহাড় থেকে সমতলে আসে ফেরার পথে এক ভাই পথ পরিষ্কার করতে থাকে ফেরার পথ সুগম করার জন্য। কিন্তু এখানেও এক ভাই পথ হারিয়ে সমতলেই থেকে যায়।

আবার বলা হয়, হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মঙ্গল কিরাতের একটি দল সপ্তকোশী থেকে বিভক্ত হয়ে একদল পাহাড়ে লিম্বু নামে অন্যদল সমভূমিতে ধিমাল নামে পরিচিতি লাভ করে।

ধিমালদের মধ্যে প্রচলিত লোককথাগুলি থেকেই জানা যায় ধিমাল ও লিম্বুরা খুব কাছের মানুষ। সম্ভবত একই বংশের।

কিরাত ঐতিহাসিক ইমান সিংচেংজন এর মতে রাই লিম্বু, ধিমালদের পূর্বপুরুষরাও হাজার বছর পূর্বে কামরূপ থেকে এসেছিল। আবার সাংলাং রাজাকে লিম্বু বলা হয়। ধিমাল ও লিম্বুরা কিরাত শাখার অন্তর্গত হওয়ায় কিরাত রাজার বৈঠকখানায় যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হত। তাই আজও ধিমাল ও লিম্বুদের ঘরে নাগরা ও তলোয়ার ঐতিহাসিক চিহ্ন হিসেবে বর্তমান। নেপালে বসবাসকারী লিম্বুদের মধ্যে যাংরুপকা থুর্পু গ্রামে সেই নাগরা আজও বর্তমান। আর ধিমালদের সঙ্গে থাকা নাগরা ও অস্ত্র-শস্ত্র রাজনৈতিক কারণ ও পুজো ব্যয়বহুল হওয়ায় নেপালের এক নদীতে বহু অস্ত্র-শস্ত্রসহ নাগরাকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই ওই নদী

আজও নাগরা ডুব্বা নামে পরিচিত। মেঘালয়ের বীরেন হাজং এর লেখা 'The Hajongs and their struggle' গ্রন্থে উল্লেখ পাই যে ধিমালরা বোড়ো, কোচ, হাজাং বা হোজাই একই বংশের পূর্বপুরুষ। একই জায়গা আসাম থেকে এসেছে। আবার 'A History of Assam' গ্রন্থে উল্লেখ আছে ব্রহ্মপুত্র ও কোশী নদীর মধ্য ভূ-ভাগের পাহাড়ি পাদদেশই হল কোচ, মেচ ও ধিমাল জাতির আদি বাসস্থান। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও 'বাঙালির উৎপত্তি বিষয়ে বঙ্গদর্শন'-এ প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন যে তিনিও আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে বোড়ো, মেচ ও ধিমালদের দেখতে পান যাদের সঙ্গে বাংলার কোচদের বিশেষ মিল রয়েছে। তবে ধিমাল জনজাতি যে ভারতের অন্যতম প্রাচীন জনজাতি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উত্তরবঙ্গ ও নেপালে বসবাসকারী ধিমালরা বিশ্বাস করে যে প্রাচীনকালে ধিমালদের পূর্বপুরুষদের অবস্থান ছিল চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে। পরবর্তী সময়ে এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা দক্ষিণ দিকে বার্মা হয়ে পাতকোই পাহাড় এবং আরো পরে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (আসাম) প্রবেশ করে; এবং এখানে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে দীর্ঘদিন বসবাস করে সেখান থেকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স হয়ে তরাই অঞ্চলে প্রবেশ করে। যার পূর্ব নাম ছিল মোরাং। শিলিগুড়ি শহরের উপর দিয়ে বয়ে চলা মহানন্দা থেকে নেপালের সীমান্ত লাগোয়া মেচি নদী পর্যন্ত মোট কুড়ি (২০) মাইল লম্বা ও ষোল (১৬) মাইল চওড়া জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পূর্বমোরাং নামে পরিচিত ছিল। এই পূর্ব মোরাং হয়েই কিছু ধিমাল পশ্চিম দিকে নেপালের ঝাঁপা ও মোরাং জেলায় পাড়ি জমিয়েছে। এই সময় Hodgson সাহেব ধিমালদের লক্ষ করেছিলেন অন্যান্য জনজাতির সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করতে। তিনি লিখেছেন—

> "The Dhimals, whose numbers do not now exceed 1500 souls, are at present confined to that portion of the saul forest lying between the konkai and the Dhorla, mixed with Bodo, but in separate villages and without intermarriage."[৭]

এরপরে ১৮৭২ সালে E.T.Dalton সাহেব তাঁর 'Descriptive Ethnology of Bengal' গ্রন্থে নিজে ধিমালদের সম্পর্কে তেমন কিছু না বলে শুধুমাত্র Hodgson সাহেবের মতামতকেই ব্যক্ত করেছেন—

> "Hodgson describes the Bodo and Dhimal tribes as

> the same race and the appears no reason for separating them in work of this nature, as their customs, religion & etc. appear nearly identical."[৮]

তবে অনেকে সহজ সরল শান্তিপ্রিয় সাদাসিধে প্রকৃতির ধিমালদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। E.A.Gait বলেছেন—

> 'They often call themselves Rajbanshis, their title is moulik (mallik)'[৯]

তবে তিনি তৎকালীন উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের সঙ্গে ধিমালদের বিভিন্ন আচার-আচরণের বাহ্যিক মিল দেখেই হয়তো ধিমালদের সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তবে ধিমালরা যে রাজবংশী থেকে ভিন্ন সে বিষয়ে কোন লেখকেরই আর সন্দেহ নেই। ১৯০১ সালে প্রকাশিত 'Darjeeling District Gazeteers' এ O.Mally বলেছেন—

> 'Dhimals are nonhinduised Koch.'[১০]।

বর্তমান ধিমালদের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকেও জানতে পারা যায় যে ধিমালরা রাজবংশীদের সংস্কার রীতি-নীতি কিছু গ্রহণ করলেও রাজবংশী পরিচয় দিতে নারাজ। আসামে বসবাসকারী দিমাসা/ডিমাছাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও নেপালের ঝাঁপা ও মোরাং জেলায় বসবাসকারী ধিমালদের বেশ কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই দুই জনজাতির লোকেরাই নদী তীরবর্তী অঞ্চলের জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে বাস করতে পছন্দ করে এবং উভয় জনজাতিরই মাছ ধরার প্রতি বিশেষ ঝোঁক বা নেশা রয়েছে।

ধিমালরা যখন উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে তখন উত্তরবঙ্গ ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তারা এই ঘন জঙ্গলের মধ্যেই শিকার, পশুপালন ও জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন সময় উত্তরবঙ্গ তথা মোরাং বিভিন্ন রাজাদের দখলে আসে, আর বারবার ধিমালদের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে আঘাত আসে। কোন সময় শাসকগোষ্ঠীর হাতের পুতুলে পরিণত হয়। আবার কখনো কিছু ক্ষমতা হাতে পায়। এভাবেই তরাই অঞ্চলের নানা চড়াই-উৎরাই এর মধ্যে দিয়ে ধিমালদের জীবন সংগ্রাম চলতে থাকে। এইভাবেই একসময় ভুটান রাজার শাসনকালে তাদের হাতে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। আর এখান থেকেই নাকি সমস্ত ধিমালরা মল্লিক পদবী

গ্রহণ করতে থাকে। তবে এর সত্যতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে যে ধিমালদের প্রত্যেক বাড়ির এক কোণে আগে মৌলি নামে একপ্রকার গাছ ছিল যেটিকে তারা পুজো করত, এই গাছ থেকেই তাদের পদবী হয়েছে মৌলিক বা মল্লিক। আবার কোন কোন ধিমাল বলেছেন ঘরের মূল খুঁটিকে তারা পুজো করত। এই মূল খুঁটি থেকে মল্লিক হয়েছে। যাই হোক ভুটানের শাসনকালে ধিমালরা স্থানীয় তহশীলদারে পরিণত হয়। তাদের হাতে ন্যস্ত হয় রাজস্ব আদায়ের ভার। তারা এমনকী শাসন করার জন্যও কিছু ক্ষমতা পায় অর্থাৎ দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারত। তবে উত্তরবঙ্গে কোন শাসনই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিভিন্ন শাসকের পালাবদল যেমন চলতে থাকে তেমনি ধিমালদের জীবনেও চলতে থাকে পালাবদলের খেলা।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে উত্তরবঙ্গে ইংরেজদের আগমনেই সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত হয় ধিমাল জীবন। ধিমালরা হয়ে পরে দিশেহারা। ইংরেজরা এসে উত্তরবঙ্গে চা-বাগান পত্তন, রেল-রাস্তা নির্মাণ ও বনভূমিকে সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করলে তাদের ভ্রমণশীল জীবনে বাধা পড়ে। খাদ্যের সঙ্কট দেখা দেয়। ফলে নিজস্ব জীবনছন্দে বাঁচার আশায় তারা উত্তরবঙ্গের তরাই ত্যাগ করে নেপালের ঝাঁপা ও মোরাং জেলার তরাই অঞ্চলে বসতি নির্মাণ করতে বাধ্য হয়। তাই ১৮৪৭ সালে Hodgson সাহেব যে সংখ্যক ধিমাল উত্তরবঙ্গে দেখতে পেয়েছিলেন পরবর্তীতে তার সংখ্যা আরও কমে যায়। যা একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল—

সন	জনসংখ্যা	সূত্র
১৮৪৯	১৫০০	বি.এইচ.হজসন
১৮৭২	৪৭২	সরকারি জনগণনা
১৮৮১	৬৬২	ঐ
১৮৯১	৬৩১	ঐ
১৯০১	৬০৭	ঐ
১৯১১	৪৪৪	ঐ
১৯৩১	৩৭৫	ঐ
১৯৮১	৫১৪	ধিমাল সংঘ (উত্তরবঙ্গ)
১৯৯৪	৮০৪	ধিমাল অস্তিত্ব রক্ষা সমিতির হিসাব অনুযায়ী

২০০৩	৯৮৯	গর্জনমল্লিক ও প্রসেনজিৎ মল্লিক (ধিমাল অস্তত্ব রক্ষা কমিটির সম্পাদক)
২০১৫	১০০২	গবেষকের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষা

বয়সের ক্রম ও লিঙ্গ অনুযায়ী ধিমাল লোকসংখ্যাকে একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল—

ক্রমানুযায়ী বয়স	পুরুষ	নারী	মোট	শতকরা
০-৫ বছর	৮১	৭৬	১৫৭	১৫-৬৬
৬-১৩ বছর	৭৪	৭১	১৪৫	১৪.৪৭
১৪-২১ বছর	৭১	৬৬	১৩৭	১৩.৬৭
২২-২৯ বছর	৬২	৬২	১৩০	১২.৯৭
৩০-৩৭ বছর	৬৪	৬০	১২৪	১২.৩৭
৩৮-৪৫ বছর	৫৮	৫৪	১১২	১১.১৭
৪৬-৫৩ বছর	৪৯	৪৭	৯৬	৯.৫৪
৫৪-৬১ বছর	৩৪	৩১	৬৫	৬.৪৮
৬২-৬৯ বছর	১২	১২	২৪	২.৩৯
৭০-এর বেশি	৫	৭	১২	১.১৪
			১০০২	১০০

তথ্যসূত্র :

১. ধর, কমলেন্দু (সম্পাদিত)। 'স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ' দেশকাল, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ-৪৩।

২. ঘোষ, সেমন্তী। 'দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা' গাংচিল, কলকাতা, ২০০৪, পৃ-৮০।

৩. বসু, স্বপন ও দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত)। 'বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি' পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ২০০০, পৃ-১৭৩।

৪. Risley, H.H. 'The Tribes and Castes of Bangal' (Vol-I), Firma KLM, Calcutta, 1998, Page-225

৫. চৌধুরী, কমল (সম্পাদিত)। 'দার্জিলিঙের ইতিহাস' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃ-৬৩।

৬. Regmi, Rishikeshab Raj. 'The Dhimal Miraculous Migrants of Himals', Nirmala Publication, New Delhi, 1991, Page-93.

৭. Hodyson, Brian Houghton. 'Miscellaneous Essays Relating to Indian Subjects' (Vol-I), Asian Educational Services, New Delhi, 1992, Page-115.

৮. Dalton, E. T. 'Descriptive Ethnology of Bengal' Government of West-Bengal, Cosmo Publications, Delhi, 1973, Page-87.

৯. Cencus of India (1901), Vol-VIA, The Lower Provinces of Bengal and their Feudatories, Calcutta, Bengal Secretariat Press, Page-625.

১০. O' Malley, L.S.S. (1907). 'Bengali District Gazetteers : Darjeeling', Logos press, New Delhi, 1999, Page-63.